মরমী কবি পাগলা কানাই

অলকানন্দা মালা

*আউল বাউল লালনের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে জন্মেছিলেন মরমী কবি **পাগলা কানাই**। যার সুর ও লেখনি সমৃদ্ধ করেছে আমাদের সংগীতাঙ্গন। চলুন জেনে নেই বাউল সাধক পাগলা কানাইয়ের কথা। 'ভব পারে যাবি রে অবুঝ মন, আমার মন রে রসনা, দিন থাকিতে সাধন ভজন, করলে না।' এমন অনেক ভাববাদী গানের স্রষ্টা **পাগলা কানাই**।*

৮ মার্চ ১৮০৯-১২ জুলাই ১৮৮৯

পাগলা কানাইয়ের জন্ম ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ১২১৬ সালে। সে বছরের ২৫ ফাল্গুনে তৎকালীন যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার, বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার লেবুতলা গ্রামে এক হতদরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কানাই। তার বাবার নাম কুড়ন শেখ। আর মা মোমেনা বিবি। কুড়ন-মোমেনা দম্পতির দুই ছেলে এক মেয়ের মধ্যে কানাই ছিলেন বড়। শৈশবে কানাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য দারস্থ হয়েছিলেন মক্তবের। কিন্তু তাকে বাঁধতে পারেনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নিয়ম কানুন। ছোটবেলায় কানাই ছিলেন অতি দুরন্ত ও ভবঘুরে। শান্তশিষ্ট বালকের মতো শিক্ষকের কাছে বসে পাঠগ্রহণ সম্ভব হয়নি তার। তাই এক সময় মক্তবে যাতায়াত ছেড়ে পড়ালেখাকে ছুটি দেন তিনি। এরপর আর ওমুখো হননি কানাই। নিজের পাঠশালা বিমুখতা নিয়ে একটি গানও বেঁধেছিলেন তিনি। তবে সেখানে নিজের ওপরই দোষ চাপিয়েছেন।

লেখাপড়া শিখব বলে পড়তে
গেলাম মক্তবে
পাগলা ছ্যাড়ার হবে না কিছু
ঠাট্টা করে কয় সবে।
ছ্যাড়া বলে কিরে তাড়ুম তুড়ুম
মারে সবাই গাড়ুম গুড়ুম

বাপ এক গরীব চাষা
ছাওয়াল তার সর্বনাশা।

সে আবার পড়তে আসে কেতাব
কোরান ফেকা
পাগলা কানাই কয় ভাইরে পড়া হল
না শেখা।

খুব বেশিদিন পিতার সান্নিধ্য ভাগ্যে জোটেনি কানাইয়ের। প্রিয়জনের মৃত্যু অনেক সময় মানুষকে বদলে দেয়; কিন্তু কানাইয়ের এমন হয়নি। স্বামীর মৃত্যুতে তিন সন্তান নিয়ে অকুল পাথারে পড়েন তার মা মোমেনা বেগম। কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এদিকে বড় সন্তান কানাইয়েরও তেমন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। পিতার অবর্তমানে পরিবার ঢাল হয়ে না দাঁড়িয়ে নিজের মতোই চলছিলেন। নিজের আনন্দে কাটাচ্ছিলেন দিন। এতে বিচলিত হয়ে পড়েন তার মা। তাছাড়া এতগুলো মুখের অন্ন জোগাতেও হিমশিম খাচ্ছিলেন। বাধ্য হয়ে তাই কানাইকে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চেউনে ভাটপাড়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

বাবার মতো কানাইয়ের মা'কেও পরমায়ু দানে একটু কার্পণ্যই করেছিলেন বিধাতা। কানাইকে আত্মীয় বাড়ি পাঠানোর কিছুকাল পরই ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি। এবার যেন চিন্তায় ছেদ পড়ে উদাস কানাইয়ের। অভিভাবক হারিয়ে ছোট বোন ও ভাই নিয়ে অকুল পাথারে পড়েন তিনি। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে চলে আসেন বেড়বাড়ি।

এসময় ভাইবোন নিয়ে আশ্রয়হীন পাগলা কানাই তার এক ফুপুর বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পান। বিনিময়ে ফুপুর ফায় ফরমায়েশ খাটতে হতো আর তাদের গবাদি পশুর দেখাভাল করতে হতো। এভাবে কোনোমতে যখন দিন কাটছিল তখন ফের আশ্রয়হীন হতে হয় কানাইকে। কেননা অল্পদিনের ব্যবধানে ফুপু ও তার মেয়ে দুজনেই মৃত্যু হয়। তবে এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল কানাইয়ের। মাথা গোঁজার বিকল্প আশ্রয় তৈরি ছিল। কেননা ততদিনে বোন স্বরনারীর বিয়ে হয়েছে। কানাইয়ে এই বেহাল দশায় আশীর্বাদ হয়ে আসে বোন স্বরনারী। স্বরনারী ছিলেন একটি অবস্থাপন্ন ঘরের বধূ। অবস্থা ভালো হওয়ায় ভাইকে নিজের কাছে রেখে দেন স্বরনারী।

এতে চালচুলোহীন উদাস কানাইয়ের যেন গতি

হয়। বোনের সংসারের গরুগুলো দেখাশোনার ভার পড়ে তার কাঁধে। সারাদিন ক্ষেত-খামারে গরু চরাতেন তিনি। কানাই ছিলেন স্বভাবকবি। আর কবি বলতেই প্রকৃতিপ্রেমী। গরু চরাতে গিয়ে তিনি উপভোগ করতে থাকেন প্রকৃতির সৌন্দর্য। খোলা মাঠে উদাস বাতাসের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বাঁধতে থাকেন নতুন নতুন গান। সেই গানে সুর বসিয়ে গাইতেন। অবস্থাসম্পন্ন বোনের বাড়িতে ঠাঁই পেয়ে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। মনের সুখে সংগীত সাধনা করতে পারছিলেন। আগেই বলেছি স্বভাবে চঞ্চল গোছের ছিলেন কানাই। সেইসঙ্গে উদাসও। এ স্বভাবের কারণে অনেকেই তাকে ভালোবাসত। জানা যায়, এই পাগলাটে স্বভাবের কারণে তাকে ভালোবেসে সবাই ডাকতেন 'পাগলা কানাই' বলে। সেখান থেকেই পাগলা কানাই নামে সর্বজনের কাছে পরিচিতি পান তিনি।

পাগলা কানাই বোনের বাড়িতে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ সে আরাম আয়েশের জীবন ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে আসেন। মাগুরা জেলার আঠারখাদার জমিদার চক্রবর্তী পরিবারের বেড়বাড়ির নীলকুঠিতে দুই টাকা বেতনে খালাসির চাকরি নেন তিনি। প্রায় চার বছর কাজ করেন এখানে। বেতন ভালো হলেও এ চাকরি বেশিদিন করেননি কানাই। গানের টানে ফের রাস্তায় নামেন তিনি। হাতে তুলে নেন একতারা। সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই পাগলা কানাইয়ের। তবে ভাব ছিল মনে। আর প্রকৃতিকেই শিক্ষক রূপে নিয়েছিলেন কানাই। অসংখ্য ধুয়ো গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এর শুরুটা ছিল বোনের বাড়ি থেকে। গবাদি পশু চরাতে চরাতে আপন মনে ধুয়ো-জারি গান বাঁধতেন ও গাইতেন তিনি। সেসময় আশেপাশের সবাই কানাইয়ের গান উপভোগ করতেন। মূলত এভাবেই ধুয়ো ও জারি গানে জড়িয়েছিলেন পাগলা কানাই। তিনি যদিও এ ঘরানার গানের জনক না। তবে ধুয়ো ও জারি গান সমৃদ্ধ করতে তার অবদান অপরিসীম। তবে খালাসির চাকরির সময়কাল তার শিল্পী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চাকরির পাশাপাশি তখনও গান রচনাও অব্যাহত ছিল তার। চারদিকে কানাইয়ের পরিচিতি মূলত এখান থেকেই ছড়াতে শুরু করে। পরে খালাসির চাকরি ছাড়ার পর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তার গান।

পাগলা কানাই একজন খাঁটি বাউল ছিলেন। এদেশের পথে প্রান্তরে একতারা হাতে ঘুরে ঘুরে নিজের বাণী বিলিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক বাউলই গুরুমুখী হন। তবে পাগল কানাইয়ের জীবনের অনেক তথ্য নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। কানাইয়ের বেশি বিচরণ ছিল যশোর অঞ্চলে। ওই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আসরে আসরে গান শোনাতেন তিনি। তাই ধারণা করা হয়, নয়ন ফকিরকে তার গুরু বলে মানতেন তিনি। পরে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলগুলোতে বেশি আনাগোনা ছিল তার। সেসময় কবি ফকির আলীমুদ্দীনের সাথে তার একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আলীমুদ্দীন ছিলেন পাবনার বিখ্যাত ভাবুক কবি। পাগলা কানাইয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় উদ্ভাসিত ছিল তার ভেতর। মনে প্রাণে ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন তিনি। তার গানে স্রষ্টা ও রাসুল বন্দনা বেশি দেখা যায়। যেমন–

ও, মোমিন মুসলমান, কর এই আকবারের কাম
বেলা গেল হেলা করি বসে রয়েছো
গা তোল্ গা তোল্

কিংবা

মাগরেবের ওয়াক্ত হয়েছে, এই সময় নামাজ পড়
গেলো দিন
শুন মুসলমান মোমিন
পড় রব্বিল আলামিন
দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন
দ্বীনের মধ্যে প্রধান হলো মোহাম্মদের দ্বীন।

তবে শুধু নিজের ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন না কানাই। অন্য ধর্মেও শ্রদ্ধা অটুট ছিল তার।

সংসারী হয়েছিলেন পাগলা কানাই। ছিল সন্তানও। তবে ঘরের শেকল তাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। নিজ গ্রামের আমেনা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয় কানাইয়ের। আমিনা ছিলেন দরিদ্র কৃষকের মেয়ে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, কানাই-আমেনার ঘরে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তারা হলেন গহর আলী, বাছের আলী, ইরাদ আলী। পাগলা কানাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৮৮৯ সালে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তার শেষ ইচ্ছা ছিল তার অন্তিম শয্যা যেন বেড়বাড়িতে দেওয়া হয়। ফলে সেখানেই চিরনিদ্রায় শয়িত করা হয় তাকে। ঝিনাইদহ সদর থেকে ৭ কিমি দূরে অবস্থিত তার মাজার। সদর থেকে এই মরমী কবির মাজারে যেতে হলে রিকশা কিংবা ছোট যানবহনে করে যেতে হবে। তারাই আপনাকে নিয়ে যাবে এই স্বভাব কবির চিরনিদ্রার স্থলে। যেখানে ঘুমিয়ে আছেন সংগীতের ভান্ডার।

জীবদ্দশায় অসংখ্য গান লিখেছেন পাগল কানাই। সেসব আজ গবেষকদের গবেষণায় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মরমী কবির সৃষ্টি গবেষণা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে পাগলা কানাই স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ। এছাড়া পাগলা কানাই সংগীত একাডেমিও রয়েছে। তারা প্রতিনিয়ত তার গানের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। ভালোবেসে তার বাণী হৃদয়ে ধারণ করেছে।